‘দেখা ’ যা দেখায়

দীপেন্দু চক্রবর্তী

সিনেমা তো দেখি না ,সিনেমা আমাদের দেখানো হয়। অর্থাৎ আমাদের দেখা ব্যাপারটা ক্যামেরার অবস্থান ও সম্পাদনা সর্বক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে। এটা যদি সব ফিল্মের ক্ষেত্রে সত্যি হয় তবে গৌতম ঘোষের ‘দেখা’ ছবির ক্ষেত্রে তা নতুন একটা অর্থ অর্জন করে। এ ছবির নাম ‘দেখা’ উপজীব্য বিষয়ও ‘দেখা ’ এবং এ ছবি আমাদের দেখায় কী ভাবে একজন প্রায়-অন্ধ মানুষের দেখা-না -দেখার জগতকে দেখতে হবে। এখানে একটানা গল্পের মসৃণ পথটি নেই যা দর্শকের মন অনায়াসে অনুসরণ করতে পারে। যে মানুষ একদা দেখতে পেত ,এখন প্রায় দেখতে পায় না, সেই মানুষ যদি একজন কবি হয় ,এবং তাও যদি একাকী হয়ে যায়, তবে তার মানসচক্ষে অতীত আরো জীবন্ত হয়ে উঠে । অতএব প্রায়ান্ধ কবি শশীভূষণের মন হঠাৎ হঠাৎ তার অতীত জীবনের টুকরো টুকরো ছবি টেনে আনে। আর সেগুলো বর্তমানের নানান মুহূর্তে সংলগ্ন হয়ে একটা কোলাজ তৈরি হয় । এই কোলাজ নির্মাণই ‘দেখা’ ছবির অভিনব আবেদন ,যা বাংলা চলচ্চিত্রে দেখা যায়নি । তবে শুধু এই কোলাজেই ছবির গোটা কাঠামো ভরে উঠলে বলা যেত গৌতম তাঁর পূর্বতন চলচ্চিত্র - রীতি থেকে পুরোপুরি সরে এসে যাকে বলে উত্তর - আধুনিক আখ্যান তা ধরার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু ‘দেখা’ ছবির আপাত খাপছাড়া কাঠামোর মধ্যেও আছে একটি কেন্দ্রবিন্দু --শশীভূষণের অতীত ও বর্তমান , আছে দুটি জীবনের মিল ও অমিলের সহাবস্থান -- শশীভূষণের ও সরমার ,এবং দুটি অন্ধ মানুষের জীবন ও জগত সম্বন্ধে দুরকম উপলব্ধি---শশীভূষণ ও গগনের । শশীভূষণকে কেন্দ্র রেখে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে তার মিল - অমিলের বুননটিই প্রমাণ করে গৌতমের ছবির কোলাজ-রীতি আমাদের অভ্যস্ত দৃষ্টিকে বিচলিত করলেও তার ভেতর থেকে একটি যোগসূত্রের আভাস পাওয়া যায় ।

শশী একজন কবি , জীবন নিয়ে অনেক খেলা করেছে তার জন্য তাকে মূল্যও দিতে হয়েছে । স্ত্রী তাকে ত্যাগ করেছে । এখন তার চেতনায় শুধু ক্লান্তি ও বিষণ্ণতা । কবিতা লেখা থেমে গেছে , তার জায়গায় এসেছে পুরনো দিনের গানের রেকর্ড শোনা । জীর্ণ পৈত্রিক প্রাসাদে এখন ও পুরনো আমলের একটি প্রেস চালায় । তাতে তার যতটা না উপকার হয় তার চাইতেও বেশী উপকৃত হয় লিটল ম্যাগাজিন বা ঐ ধরনের ছোট প্রকাশকেরা । জীবন সম্বন্ধে শশীর যে তিক্ততা বোধ মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে তা ভেদ করে আবার উঁকি দেয় তার বদান্যতা । ক্ষয়ে যাওয়া সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি মানবিক দিক তাকে অতীত ও বর্তমান এই দুই যুগের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রাখে । বোহেমিয়ান জীবনযাপন করে,আধুনিক কবিতা লিখেও ,সে তার বাড়িটি প্রমোটারের হাতে তুলে দিতে চায় না, তাদের পুকুরে আশেপাশের মানুষ স্নান করবে,এই জনমুখী মনোভাব সে এখনও ত্যাগ করেনি তার মিনিক্যাল অবস্থান সত্ত্বেও । অথচ এই সেই মানুষ যে কিনা একসময় নারীকে সম্ভোগের বস্তু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি ।

শশীর স্মৃতিচারণের মধ্যেই হয়তো প্রচ্ছন্ন থাকে এক ধরণের আত্মবিশ্লেষণ ,যা অনেককে আশ্বস্ত করে । দৃষ্টিহীনতা মানুষকে অন্যরকম একটা দৃষ্টি দান করে,(কিং লিয়রে র এ সম্পর্কে একটি বিখ্যাত উদ্ধৃতিও সে দেয়) যার ফলে শশী জীবনের উপান্তে এসে শুধু অতীতচারিতাতেই আশ্রয় খোঁজে না, তার বর্তমান অস্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিকতাকে নতুন ভাবে উপলব্ধি করে । আমাদের রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ দ্বন্দ্ব তাকে পীড়া দেয় ।

গৌতম এই মানুষটিকে বাস্তববাদী রীতিতে উপস্থিত করেননি , তাঁর চিত্রণপদ্ধতিতে কয়েকটি তুলির আঁচড়ই থাকে ,বাকিটা ভরিয়ে নিতে হয় দর্শকদের । এদিক থেকে এ-ছবি দর্শকদের দায়িত্ব বাড়িয়ে দেয় । বারবার শশীর স্মৃতিচারণায় এমন একটা ফ্রেম ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে শশী নেই ,আছে তার স্ত্রী, বা অন্য কেউ , যেমন দেখি একজন কল গার্লকে, অথচ তারা শশীর সঙ্গে কথা বলে। শশীর অবস্থান তখন দর্শকদের মধ্যে । আমরা মধ্যবিত্ত দর্শক তখন যেন শশীর সঙ্গী হয়ে উঠি । শশীর ব্যাভিচার হয়তো আমাদের অনেকের মনঃপূত হবে না ,তা নিয়ে তর্কও উঠেছে , এবং বিশেষ করে সমাজ ও সময় নিয়ে , এখন একটি ‘লম্পট’ মানুষের বড় বড় বাণী দেবার অধিকার নিয়ে । কিন্তু আমাদের মধ্যে এই লাম্পট্য যদি নাও থাকে ,তাহলেও অন্যরকম অনৈতিকতা আছে , তৎসত্ত্বেও তো আমরা অহরহ সমাজ ও সময় সম্বন্ধে রায় দিয়ে চলি। এটাও তো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের এক অপ্রতিরোধ্য প্রবণতা । গৌতম শশীকে কোনো

বিশেষ মতার্দশের দৃষ্টিকোণ থেকে কশাঘাত করেনা , যেমনটি করেছিলেন ঋত্বিক ঘটক । যুক্তি তক্কো গপ্পো -য় । একবারই শশীকে অপদস্থ হতে হয় ,যখন লিটল ম্যাগাজিন করা এ প্রজন্মের একটি মেয়ে শশীর গর্বিত নারীসঙ্গ কামনা ও অভি জ্ঞতার পাল্টা একটা মডেল উপস্থিত করে ,যা কিনা পুষ সঙ্গলাভের জন্য নারীর নিজস্ব অধিকার, যে দিকটা শশী তেমন গুরুত্ব দিয়ে ভাবেনি । এই সূত্র ধরেই সরমা ও গগনের দৈহিক সম্পর্কটা অর্থবহ হয়ে উঠে । এ শুধু একজন বিবাহিতা ও অধুনা বিচ্ছিন্ন নারীর অবদমিত কামনার আকাঙ্খিত উৎসার নয় এখানে যৌন সম্পর্কে নারীর অগ্রাধিকারের একটা সংকেত ও থেকে যায় । কেননা সরমার চিত্রকর স্বামী যে রকম থত্মণ্ডদ্ধ -র অনুরাগী সেখানে নারীকে দেখানো হয়েছে ত্রড্রদ্ধ থচণ্ণড্রট্রবহিসাবেই । বন্য হাতির প্রতীকী পরিবেশে শশী সরমার ক াছে এমন একটা আবেদন রাখলেও সরমা তা অগ্রাহ্য করে । এককালের নারী ভক্ষক শশীকে তখন বড় অসহায় লাগে !

জীবনের সায়াহ্নে নারীসঙ্গ বিহীন একজন মানুষের পক্ষে মায়ের স্মৃতি অনিবার্য ,কিন্তু গৌতম শশীর মায়ের মুখ ও নাছোড়বান্দা পত্রিকা - করিয়ে মেয়েটির মুখ এমনভাবে যুক্ত করেছেন যাতে একইসঙ্গে তার মাতৃঅন্বেষণ ও অতৃপ্ত পিতৃত্বের দ্বিমুখী আকুতি চলচিচত্রের ভাষ ায় পায়িত হয় । শুধু দৃশ্যের মন্তাজে নয় ,গানের এক অভিনব ব্যবহারে এই পায়ণ এক অবিস্মরণীয় মুহুর্ত তৈরী করে । একই গান ,দুটি ভিন্ন কণ্ঠস্বর, দুটি ভিন্ন স্কেল , দুটি ভিন্ন নারীর মুখ -- একজন নবীন অন্যজন প্রবীণ ---অতীত ও বর্তমান এ ওর গায়ে জড়িয়ে যায় । গ ানের সুচিন্তিত প্রয়োগ অনেকেই লক্ষকরেছেন এ ছবিতে । শুধু রের্কডের গান দিয়ে হারিয়ে যাওয়া একটা জগত উন্মোচিত হয় তখনই যখন শশী তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। অন্ধ শশীর কাছে এখন শ্রবন ও স্পর্শই চোখের জায়গা নিয়েছে । তাই সে কাকের ডাক এমন তীব্রভাবে শোনে ,আঙুল দিয়ে বস্তু ও মানুষের আকৃতি ও চরিত্র বোঝার চেষ্টা করে । একটা ঢত্মথত্বদ্ধ এক্ষেত্রে ফুটে ওঠে --এককালের নারীবিলাসী শশী এখন আঙুল দিয়ে নারীদেহ ছোঁয় তাকে চেনার জন্য । যখন তার চোখ ছিল তখন সে অন্ধের মত শুধু নারীদেহ ভোগ করেছে । চক্ষুষ্মান লোকের অন্ধত্ব ও অন্ধ মানুষের অন্তর্দৃষ্টি --এই বিষয়টি শশীর ক্ষেত্রে আরো গুরুত্ব পায় জন্মান্ধ গগনের সহাবস্থ ানের জন্য ।

এ ছবিতে গগনের আর্বিভাব অবশ্য আর একটি মাত্রা যোগ করে । বাংলাদেশ থেকে উৎখাত হয়ে আসা গৃহহীন মানুষটি এ ছবির সাম াজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিস্তৃত করে, তবে শশীর কেন্দ্রিকতা ব্যাহত করে না। জন্মান্ধ গগনের অতীতচারিতার বিলাস নেই , বুদ্ধিজীবীসুলভ সমাজ চেতনা নেই ,সে প্রকৃতির সন্তানের মত বাঁচে যা শশীর পক্ষে সম্ভব নয় । তবে তার কথা শুনে, তার পাশে থেকে শশীর একটি বিশেষ প্রতিত্রিয়া আশা করা যায় । সে জন্মান্ধ নয় । সে এই পৃথিবীকে দুচোখ ভরে দেখেছে , এখন সেই পৃথিবী তার ক াছে আবছা হয়ে গেছে, শশী এই ব্যাপারটাকে যে রকম শান্ত মেজাজে মেনে নিয়েছে ,গগনের মুখোমুখি হয়েও সে তেমনি শান্ত থাকে ত ার অন্ধত্ব সম্বন্ধে। একজন বেপরোয়া প্রাণচঞ্চল মানুষ কী কারণে এমন শান্তভাব বজায় রাখে ,এমন কী মদ্যপানের পরও, তার ব্যাখা এ ছবিতে নেই । মনে হয় জন্মান্ধ ছিন্নমূল অশিক্ষিত গগনের উপাখ্যান আরো অর্থময় হয়ে উঠত যদি তার জীবনকে আরো খানিকটা ধর ার চেষ্টা হত। প্রশ্ন উঠতে পারে-- গগনের সঙ্গে শশীর তেমন ঘনিষ্ঠতা হলনা কেন? শশী কবি তদুপরি দরদী ,তদুপরি অন্ধ, সে সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় , আগে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা হত, এখন গোটা দুনিয়াই একটা বাজার , এমন উপলব্ধি হওয়া সত্ত্বেও তারা দুজন কাছাকাছি আসে না । গৌতম যদি সেটাই দেখাতেন , তারা কাছাকাছি আসতে পারেনা তাতেও একটা ধাক্কা খেত আমাদের মধ্যবিত্ত মন । কিন্তু মধ্যবিত্ত মনের শ্রেণীগত অভিমানকে ঘা দেবার ইচ্ছে পরিচালকের ছিল বলে মনে হয়না । বস্তুত গগনের অবস্থান সম্বন্ধে একটা অস্পষ্টতা থাকে যার ফলে তাকে শশী বা সরমার বৃত্তে একজন প্রক্ষিপ্ত আগন্তুক ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়না। ছবির আর একটি ফাঁক শশীর স্মৃতি পথে তার কন্যার অনুপস্থিতি । ছবির টুকরো টুকরো ফ্ল্যাশব্যাকে শশীর মা ও স্ত্রী আসে, আসে না তার মেয়ে। ছবিতে একজন প্রাক্তন নকশাল আসে, যার বর্তমান জীবনযাপন আজকের পেক্ষিতে বেশ স্বাভাবিক । শশী তার বিপ্লবীয়ানা নিয়ে ঠাট্টা করে, কিন্তু তার নিজস্ব শেকড়হীন সমাজচেতনাকে ঘা দেবার জন্য কেউ উপস্থিত হয় না । শশীকে মেনে নিতে যদি চিন্তাশীল দর্শকদের অসুবিধে হয়ে থাকে তবে তার কারণ এই ঃ শশীর বোহেমিয়ান জীবন ও কবিতা লেখা ('আমার বন্ধু শক্তি'কথাটা একটা বিশেষ সময়ের কবি গোষ্ঠীকে মনে করিয়ে দেয়)ছাড়া আর কি পেয়েছি আমরা যার জন্য আধুনিক রাজনীতি ,সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তার মতামত ছবিতে এতটা গুত্ব পায় ? প্রয়োজন ছিল অন্ধশশীর প্রকৃত যন্ত্রনাদগ্ধ আত্মদর্শন এবং আত্মসমীক্ষা । তা হয়নি বলে , সংব াদপত্রে কেন এখন কৃষকদের আত্মহত্যার খবরকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে ত্রিকেটের খবর সামনের পাতায় এসে যায়, এই রকম নালিশ ফ াঁপা মনে হয় ।

এই আক্ষেপটুকু বাদ দিলে দেখা অনেক দিক থেকেই এক নতুন স্বাদের ছবি, যে ছবির খাপছাড়া আঙ্গিক ইচ্ছাকৃতভাবেই দর্শকদের মনে একটি বিশেষ কৌতূহল জাগিয়েই ভিন্ন প্রসঙ্গে টেনে নিয়ে যায়, সেখানেও কৌতূহল দানা বাঁধতেই আবার নতুন প্রসঙ্গের অবত ারণা। ফলত খাপছাড়া মনে হলেও এছবি দর্শকের মনোযোগ একটানা ধরে রাখে । মফঃস্বলের দর্শকও যে 'দেখা' দেখতে ভিড় করেছে

,সেটা মনে হয় এই আঙ্গিকের গুণেই। আর একটি কারণ ,একটি মানবিক দরদী মেজাজ এ ছবিতে একটা মধুর বিষণ্ণতা ছড়িয়ে দেয় । দৃষ্টি হারানো একজন কবিরএকলা বসে থাকা ,পুরনো দিনের গান ,কাকের ডাক, দুটি ভগ্ন পরিবারের টুকরো টুকরো ছবি ,আদিম প্রকৃতির কোলে অন্ধ গায়কের গান, নানান রকম নরম রঙের ব্যবহার ---সব মিলে আজকের সাধারণ দর্শকদের একাত্ম হতে অসুবিধে হয় না । আর এগিয়ে থাকা দর্শকের ভালো লাগে নানান প্রতীকের কাব্যিক ব্যবহার --যেমন ,কাকটা কী বলতে চায় এই কথাটা, কাকের ওড়াউড়ি -একদিন এ শহরটায় কাক ছাড়া অন্য পাখি থাকবেনা, (অর্থাৎ এ এক আবর্জনার জগত),এমন মন্তব্য ,মিশতে চায় না এমন দুটি তরল রঙের আর্বত ,কলকাতার পাশাপাশি উওরবঙ্গের আদিম প্রাকৃতিক পরিবেশ ,হাতির যৌনকামনার আহ্বান নিরীহ পথচারীকে অগ্রাহ্য করে পুলিশ জীপের বেপরোয়া গতি, ভগ্নপ্রায় প্রাসাদের পাদদেশে অতি-আধুনিক প্রমোটারের উপস্থিতি (যা চেখভের ,চেরি অর্চার্ড মনে করিয়ে দেয়)এবং শেষে শশীর শূন্য চেয়ারের দোল খাওয়া আর দুধার থেকে উড়ে আসা ছেঁড়া পাণ্ডলিপি। এই শেষ দৃশ্যটি বহুমুখী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। শশী কি এক্ষুনি চেয়ার ছেড়ে উঠে গেছে ? সে কি বারান্দা থেকে খাতার পাতাগুলো ছিড়েঁ নীচে ফেলছিল আর হাওয়ায় তা ঘরে ফিরে আসে ? নাকি শশী আর নেই ,এ বাড়িতে এক ঝোড়ো হাওয়া এসে সব ওলটপালট করে দিচেছ ? একজন মানুষের অনুপস্থিতিকে এমন জোরালো ইমেজে ধরার কৌশলটি নানান ভাবে আমাদের ভাবিয়ে তোলে । ‘দেখা’ যেমন না দেখা অনেক কিছুর ইঙ্গিত রাখে তেমনি না বলা বার্তাও পৌঁছে দেয় নানান দৃশ্যে।

গৌতমের পরিচিত রীতি থেকে ‘দেখা’ এতটাই ভিন্ন যে বলা যায় চলচিচত্রকার হিসেবে এ তাঁর আর এক আরম্ভের ফলক।